দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ ...1 6 AUG 2008 ...
পৃষ্ঠা : ১৪ কলাম : ২.....

পর্যালোচনা

দুর্নীতিমুক্ত শিক্ষাঙ্গন চাই

ফোরকান আলী

দেশে সরকারী সুবিধাপ্রাপ্ত বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় ৩০ হাজার। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানকে সরকারী ভাষায় বলা হয় এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীরা বেতনের মূল অংশ পেয়ে থাকেন সরকারের কাছ থেকে। বিগত এক দশকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হয়েছে প্রধানত রাজনৈতিক বিবেচনায়। স্থানীয় সংসদ সদস্য কিংবা প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতাদের ইচ্ছায় খোলা হয়েছে ঐ ধরনের প্রতিষ্ঠান। অনেকেই প্রভাব খাটিয়ে নিজের নামে অথবা পিতা-মাতার নামে এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনের চেয়ে ব্যক্তির ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাই প্রাধান্য পেয়েছে। যে কারণে বিগত এক দশকে এমন বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। যেসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা অস্বাভাবিক কম। অথচ অনেক জায়গায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান না থাকায় শিক্ষার্থীরা ভোগান্তির কবলে পড়ছে। শিক্ষায় পিছিয়ে পড়েছে অনেক জনপদ। প্রয়োজনীয় জায়গায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান না থাকার কারণে বহু শিক্ষার্থী মাধ্যমিক পর্যায়ে ভর্তি হতে পারছে না। একটি দৈনিকে প্রকাশিত খবরে জানা যায়, রাজশাহীর ১টি উপজেলায় ২১টি কলেজ রয়েছে। যশোরের ১টি ইউনিয়নে ২টি গার্লস কলেজ রয়েছে। অথচ বান্দরবান জেলার চারটি উপজেলায় ৮টি নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন থাকলেও সেগুলো স্থাপনের কোনো উদ্যোগ নেই। শিক্ষাবিদরা বলছেন, অপরিকল্পিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের কারণে সমন্বিত শিক্ষা কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অনুমতি পেতে হলে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনসংখ্যা ন্যূনতম ৮ হাজার হতে হবে। এছাড়া পৌর ও শিল্প এলাকায় নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রে সন্নিহিত ১ কিলোমিটার এলাকার মধ্যে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান না থাকার শর্ত রয়েছে। মফস্বল এলাকার জন্য এই শর্ত তিন কিলোমিটার পর্যন্ত। একইভাবে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা হতে হবে ন্যূনতম ১০ হাজার। মহাবিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা ১০ হাজার এবং এক প্রতিষ্ঠান থেকে অন্য প্রতিষ্ঠানের দূরত্ব হবে ১০ কিলোমিটার। কিন্তু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের বেলায় এসব নিয়মের কোন অংশই মানা হচ্ছে না। ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছায় ও বিশেষ বিবেচনায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি প্রদান ও এমপিওভুক্ত করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হিসেব মতে, দেশের বিভিন্ন স্থানে ৫ হাজার ৫৯০টি অপ্রয়োজনীয় বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থাকলেও ৩ হাজার ৭০৭টি প্রয়োজনীয় স্থানে বেসরকারী কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নেই। সরকারের বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী এসব স্থানে অনেক আগেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালু হওয়ার কথা। শিক্ষা প্রশাসনের এই হিসাব অনুযায়ী দেশে সর্বোচ্চ ৩৬৬টি অপ্রয়োজনীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে দিনাজপুরে। সংখ্যার দিক দিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে যশোর জেলা। এ জেলায় অপ্রয়োজনীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩২৯টি। সরকারের বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী বান্দরবান জেলার বিভিন্ন স্থানে আরো ২৪টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রাপ্যতা রয়েছে। একইভাবে চট্টগ্রামের বিভিন্ন উপজেলায় আরো ১৩৯টি স্কুল, ১২৯টি মাদ্রাসা ও ১৮টি কলেজের প্রাপ্যতা রয়েছে। এছাড়া সামগ্রিক জনসংখ্যার অনুপাতে দেশের ১৯৭টি উপজেলায় ১ হাজার ৬৯৮টি স্কুল, [illegible] উপজেলায় ১ হাজার [illegible]টি মাদ্রাসা এবং ১৮২টি [illegible] সমন্বিতভাবে [illegible] ৩ হাজার ৭০৭টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন না থাকলেও এলাকার শিক্ষার্থীরা নিকটবর্তী স্থানে পড়াশোনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হিসাব মতে, দেশে বর্তমানে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে সবমিলিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩১ হাজার ২৫৯টি। এর মধ্যে এমপিওভুক্ত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২৯ হাজার ৭৭৮টি। রাজশাহী বিভাগে সর্বোচ্চ ১০ হাজার ৪৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। যা দেশের মোট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এক-তৃতীয়াংশ। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রে এমন বৈষম্যের প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, শিক্ষার্থী সংখ্যা ও পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল বিবেচনায় নিয়ে সরকার অপ্রয়োজনীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। একইভাবে প্রয়োজনীয় স্থানগুলোতে নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালুর বিষয়টিও সরকারের সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে বলে তিনি জানান। অপরদিকে অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাথে সরকারের বিরোধ রয়েছে। এছাড়া ব্যবস্থাপনা কমিটি নিয়ে চলছে মামলা-পাল্টা মামলা। সেই সূত্রে এক ধরনের অচলাবস্থা চলছে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। একইভাবে রাজধানীর নামকরা বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজসহ দেশের ৯৫ ভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এ ধরনের দ্বন্দ্ব-বিরোধ চলছে। নানা দুর্নীতি-অনিয়মের অভিযোগও রয়েছে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান ও ব্যবস্থাপনা কমিটির বিরুদ্ধে। কোথাও বিরোধ চলছে শিক্ষকদের সঙ্গে প্রতিষ্ঠান প্রধানের, কোথাও শিক্ষক বনাম ব্যবস্থাপনা কমিটি, আবার কোথাও বিরোধ চলছে সরকারের সঙ্গে। এসব বিরোধের সূত্রে দায়ের হয়েছে অসংখ্য মামলা-মোকদ্দমা। মামলা-পাল্টা মামলার কারণে বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হয়েছে। কোথাও কোথাও সৃষ্টি হয়েছে চরম অচলাবস্থা। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের (ডিআইএ) তদন্তে বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নানাবিধ দুর্নীতি ও অনিয়মের চিত্র পেয়েছে। ডিআইএ'র রিপোর্টে অনুযায়ী এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কিন্তু মন্ত্রণালয়ের সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা ঠুকে দেন শিক্ষকরা। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে এ পর্যন্ত ৬ হাজারেরও বেশী মামলা করেছেন দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা। ডিআইএ'র রিপোর্টে অভিযুক্ত শিক্ষকদের মধ্যে খুব অল্পসংখ্যকই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শাস্তি মেনে নিয়েছেন। শিক্ষা পরিসংখ্যান বিষয়ক সরকারী দপ্তর ব্যানবেইসের তথ্য অনুযায়ী দেশে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ৩১ হাজার ২৫৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর মধ্যে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২৯ হাজার ৭৭৮টি। এ হিসাবে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ৯৫ ভাগের বেশীই বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ১ কোটি ৩২ লাখ শিক্ষার্থীর মধ্যে ১ কোটি ২৫ লাখ শিক্ষার্থী বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষা [illegible] করছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বাড়ার কারণে শিক্ষক-[illegible] বেতন-ভাতার সরকারী অংশ ১৯৯১-৯২ সালের [illegible] কোটির স্থলে বর্তমানে প্রায় ৩ হাজার কোটিতে এসে

[illegible] বেশী হলেও সরকার এসব প্রতিষ্ঠানের তদারকির বিষয়ে কার্যকর কোন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেনি। ফলে এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে চলছে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতি। সরকারী হিসাবে স্বাধীনতার পর দেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৪ গুণ। একইসঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির হার বেড়েছে ৬ গুণ, শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা বেড়েছে ৫ গুণ এবং শিক্ষা খাতে সরকারী ব্যয় বেড়েছে ১০ গুণ। কিন্তু তুলনামূলকভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মানের তেমন উন্নতি হয়নি। বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার বিষয়ে পরিচালনা পর্ষদ বা ব্যবস্থাপনা কমিটির সর্বোচ্চ ক্ষমতা থাকায় কোন কোন ক্ষেত্রে সেই ক্ষমতার অপব্যবহার হচ্ছে। কোথাও টাকার বিনিময়ে, আবার কোথাও স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে অযোগ্য লোকদের শিক্ষক পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। আবার পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের সুপারিশ অনুযায়ী এসব শিক্ষকের এমপিও বাতিল করলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক বা কর্মচারী আদালতে মামলা ঠুকে দিচ্ছেন। সরকারী তথ্য অনুযায়ী বিভিন্ন বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা মিথ্যা তথ্য দিয়ে এবং জাল-জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে গত ৬ বছরে সরকারী তহবিল থেকে অতিরিক্ত ১৬০ কোটি টাকারও বেশী তুলে নিয়েছেন। মাধ্যমিক স্তরসহ সামগ্রিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত দুর্বল হওয়ার কারণে অধিদপ্তরসহ স্থানীয় অফিসগুলো দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। এছাড়া ব্যবস্থাপনা কমিটির হাতে সর্বোচ্চ ক্ষমতা থাকায় তারা শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতি-অনিয়মে জড়িয়ে পড়ছে। নীতিমালার বাইরে গিয়ে অবৈধ উপায়ে নিয়োগ দেয়ার কারণে ইতোমধ্যেই অপ্রয়োজনীয় শিক্ষকের সংখ্যা ৩০ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। নিয়মবহির্ভূত উপায়ে নিয়োগ পাওয়া এসব শিক্ষকের মধ্যে ৫২ শতাংশই স্নাতক পর্যায়ে তৃতীয় শ্রেণীপ্রাপ্ত, ৩৪ শতাংশ দ্বিতীয় শ্রেণীপ্রাপ্ত এবং প্রথম শ্রেণীপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা ১ শতাংশেরও নীচে। যোগ্যতাসম্পন্ন ও মেধাবীরা এ পেশায় নিয়োগ পাচ্ছে না বলেই শিক্ষার মান দিন দিন নিম্নমুখী হচ্ছে। সরকারী এক জরিপে বলা হয়েছে, ১৯ হাজার ৩৯০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২৬০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোন ব্যবস্থাপনা কমিটি নেই। ৮০৯টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন ধরে এডহক কমিটি দিয়ে চলছে। ৮ হাজার ৪০৮টি মাদ্রাসার মধ্যে ৯৭টি মাদ্রাসায় কোন কমিটি নেই। ৪৪৮টি মাদ্রাসা এডহক কমিটি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। শিক্ষকদের সঙ্গে প্রধান শিক্ষক এবং ম্যানেজিং কমিটির অন্তর্দ্বন্দ্ব ও কোন্দলের কারণে শিক্ষার মান বিঘ্নিত হচ্ছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। রিপোর্টে আরো বলা হয়, দেশে বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান বাড়ানোর জন্য বর্তমানে যে নীতিমালা রয়েছে, তা মানছে না অধিকাংশ কর্তৃপক্ষ। দেশের ৩৭২টি নিম্ন মাধ্যমিক স্কুল, ৯৪৮টি মাধ্যমিক স্কুল, ২৬২টি দাখিল মাদ্রাসা, ৩০টি আলিম মাদ্রাসা, ৭৯৭টি ইন্টারমিডিয়েট কলেজ এবং ডিগ্রী পর্যায়ের ১৮১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নীতিমালা অনুসারে ন্যূনতম শিক্ষার্থী নেই। অথচ দেশে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে সাড়ে ৫ হাজার। সাড়ে ৬ হাজার প্রতিষ্ঠানে ৩০ শতাংশ অতিরিক্ত শিক্ষক রয়েছে। এছাড়া প্রয়োজনীয় শ্রেণীকক্ষ, পাঠাগার, ল্যাবরেটরি, খেলার মাঠ, [illegible] প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণসহ ভৌত অবকাঠামো ও পরিবেশগত মানের সংকট থাকার বিষয়টিও জরিপ রিপোর্টে বলা হয়। দেশের বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রায় সবগুলোতেই শ্রেণীকক্ষের অভাব রয়েছে। প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই কাঁচা ও সেমিপাকা। শিক্ষার্থী অনুপাতে শ্রেণীকক্ষ অপ্রতুল। শতকরা ৭ থেকে ১০ ভাগ প্রতিষ্ঠানে পানীয় জলের অভাব রয়েছে। ৬ শতাংশ স্কুলে টয়লেট নেই। এছাড়া ৪০ ভাগ স্কুল, ২২ ভাগ কলেজ ও অধিকাংশ মাদ্রাসায় কোন ল্যাবরেটরি নেই। শিক্ষকরা নিয়মিত এবং যথাসময়ে ক্লাসে হাজির হন কিনা এ নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধানের কোন বিধি-নিষেধ থাকে না। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক জরিপ রিপোর্টে বলা হয়েছে, ৮০ শতাংশ শিক্ষক পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই ক্লাসে যান, ৮৫ শতাংশ শিক্ষক শিক্ষাদানের সময় প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করেন না। এছাড়া জরিপকালে দেখা গেছে, বিপুলসংখ্যক শিক্ষক কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়াই প্রতিষ্ঠানে অনুপস্থিত থাকেন। এছাড়া বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে ৪৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা করেছে দুদক। রাজধানীর নামিদামী ৮টি স্কুল-কলেজ ও রয়েছে ওই তালিকায়। প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতিবিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর থেকে দুদকের একটি বিশেষ দল এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা সংগ্রহ করেছে। কমিশনের চাহিদা অনুযায়ী পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর ৪৩টি শীর্ষ দুর্নীতিগ্রস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কোটি টাকার অনিয়ম, ভর্তি বাণিজ্য, টেন্ডার, অবৈধভাবে শিক্ষক-কর্মকর্তা নিয়োগের প্রমাণসহ সকল নথিপত্র পাঠায়। যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সবচেয়ে বেশী দুর্নীতিগ্রস্ত, সেসব প্রতিষ্ঠানের তালিকা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকে সংগ্রহ করে দুদক। কমিশনের বিশেষ দলটি এ তালিকা নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করবে। প্রথমে ৪৩টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দুর্নীতির প্রাথমিক অনুসন্ধানের জন্য যাচাই-বাছাই করা হবে। পরে দুদকের প্রাথমিক অনুসন্ধানে এসব প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতির সত্যতা খুঁজে পেলে কমিশনে প্রতিবেদন দাখিল করা হবে। কমিশন থেকে অনুমোদন পেলেই চূড়ান্তভাবে অনুসন্ধান করবে দুদক। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দুর্নীতির ক্যাটাগরি অনুযায়ী অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তারা কাজ করবে। ভর্তি বাণিজ্য, আর্থিক অনিয়ম, শিক্ষক-কর্মকর্তা নিয়োগে দুর্নীতি, টেন্ডারবাজি, পরীক্ষায় অংশগ্রহণ, উপবৃত্তি ও অনুদানের টাকা আত্মসাৎসহ বিভিন্ন দুর্নীতি এবং অনিয়মের ক্যাটাগরি অনুযায়ী দুদক অনুসন্ধান চালাবে। এরপর এই ক্যাটাগরি অনুযায়ী জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দুদক আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে। একইসঙ্গে এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে সুপারিশ পাঠানো হবে। দুদকের চাহিদার ভিত্তিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর তাদের নিজস্ব তদন্তে অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া গেছে এমন প্রতিষ্ঠানের একটি তালিকা তৈরি করে। এ তালিকার মধ্য থেকে অধিক দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিতে রাজধানীর নামিদামী ৮টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ ঢাকা বিভাগ থেকে ১১টি, রাজশাহী বিভাগ থেকে ১২টি, চট্টগ্রাম বিভাগে ১০টি এবং খুলনা ও বরিশাল বিভাগের ১০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তালিকা দুদকে প্রেরণ করা হয়। এর আগে কমিশন দুদকের উপ-পরিচালক সৈয়দ ইকবাল হোসেনকে প্রধান করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি অনুসন্ধানের জন্য একটি বিশেষ দল গঠন করে। এ বিশেষ দলে দুইজন সহকারী পরিচালক ও দুইজন সহকারী পরিদর্শক সদস্য হিসেবে কাজ করছে। আমরা আশাকরি কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যেন কারো লালসার শিকার না হয়, পাশাপাশি শিক্ষাঙ্গন থেকে দুর্নীতি চিরতরে দূর হউক।

❑ লেখক : সাবেক প্রিন্সিপাল